Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলাম প্রচারে নারীদের ভূমিকা

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: মামুনুর রশীদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আফরিনা আক্তার

রোলঃ 216020225

২৩ মে,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলাম প্রচারে নারীদের ভূমিকা

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: মামুনুর রশীদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আফরিনা আক্তার

রোলঃ 216020225

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "ইসলাম প্রচারে নারীদের ভূমিকা" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে আফরিনা আক্তার, আইডিঃ 216020225 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: মামুনুর রশীদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " ইসলাম প্রচারে নারীদের ভূমিকা " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মামুন উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

তারিখঃ

২৩ মে, ২০২৪ ইং

(স্বাক্ষর)

আফরিনা আক্তার

আইডিঃ 216020225

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

প্রবন্ধকের কথা 5
শুরুর কথা 6
ইসলামে নারীর মর্যাদা 7
দ্বীন প্রচারে নারীদের ভূমিকা 7
ইতিহাসের পাতায় ইসলাম প্রচারে বীরমহিয়সী নারীদের অবদান 8
মা হাজেরা আ. 8
মরিয়ম (আ.) 9
বিবি আসিয়া (আ.) 10
হজরত খাদিজা (রা.) 11
হজরত ফাতেমা (রা.) 13
হজরত আয়েশা (রা.) 14
হাবশায় হিজরতে মহিলাদের অবদান 15
মক্কায় মজলুম পাঁচ কৃতদাসী 15
রাবেয়া বসরী (রহ.) 16
রাষ্ট্রপ্রধানের উপদেষ্টা উম্মে সালমা (রা) 17
যুবায়দা (রা.) 18
হাফসা (রা.) 18
খন্দক যুদ্ধে সাফিয়্যা (রা) 19
উম্মে উমারা রা. 19
হযরত উমার রা. এর খুতবায় প্রতিবাদ করলেন যে নারী 20
ইরামুক ও কাদিসিয়ার রণাঙ্গনে নারী 20
অন্যান্য যারা 21
বর্তমান সমাজে ইসলাম প্রচারে নারীদের ভূমিকা 26
বর্তমান সময়ে নারীদের করণীয় 27

প্রবন্ধকের কথা

সকল প্রশংসা আল্লাহ মেহেরবানের যিনি আমাদেরকে ঈমান ও ইসলামের পথ দেখিয়েছেন। ' আমরা পথের দিশা পেতাম না, যদি আল্লাহ আমাদের পথ না দেখাতেন'। (আল- আরাফ: ৪৩)

কালের পথপরিক্রমায় মুসলিম উম্মাহ এখন এক জটিল যুগসন্ধিক্ষণে অবস্থান করছে। আঁধার রাত ও সুবহে সাদিকের মাঝে যেন চলছে লুকোচুরি। মুসলমানের ঘুম ভেঙেও যেন ভাঙছে না। হতাশা ও ভীতির কালো মেঘে এখনও দিগন্ত আচ্ছন্ন।

উম্মাহর এই সঙ্গীন ও নাজুক মুহূর্তে মুসলিম নারীর চেতনা ও দায়িত্ববোধ কেমন হওয়া উচিত? কর্মবন্টন ও দায়িত্বের শ্রেণিবিভাগ কি গাফিলতি ও অলসতার অনুমোদন দেয়? সালাফদের আদর্শ ও সিরাত কি শুধু পুরুষদের জন্য? বিষয়গুলো মা বোনেদের ভেবে দেখা উচিত। শুধু ভাবলে হবে না ; হিম্মত ও প্রত্যয়, প্রজ্ঞা ও কৌশল, যিকির ও ফিকিরের সাথে কাজে আত্মনিয়োগ করা জরুরি। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আসলাফের জীবনদর্শন ও জীবনাদর্শের আলোকে নতুন ভাবে ঢেলে সাজানো উচিত।

অতীতের হারানো গৌরবের কিছু ইতিবৃত্ত স্মরণ করিয়ে দিয়ে মুসলিম নারীরা যুগ যুগ ধরে কিভাবে ইসলাম প্রচারে নিয়োজিত ছিলেন আর বর্তমানে নারীরা কিভাবে নিজেকে গড়ে তুলবেন সে বিষয়েই আলোচনাই হল আমার ছোট্ট পুস্তিকাটির মূল উদ্দেশ্য।
ওয়ামা তৌফিকি ইল্লা বিল্লাহ।

শুরুর কথা

মহান আল্লাহর শাশ্বত বাণী ইসলাম প্রচার, ন্যায়নিষ্ঠ সমাজ প্রতিষ্ঠা এবং জ্ঞানচর্চায় উন্নতি ও অগ্রগতির ক্ষেত্রে পুরুষদের পাশাপাশি মুসলিম নারীরাও যুগ যুগ ধরে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে যাচ্ছেন। ইসলামী সমাজ বিনির্মাণ ও জ্ঞানচর্চায় নিরলস সাধনার পাশাপাশি পারিবারিক উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকার স্বাক্ষর রাখছেন মহান রবের অপরূপ সৃষ্টি নারীগণ। নারীরা হলো মানবজাতির ওপর আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ নেয়ামত যারা আমাদের পারিবারিক জীবনকে শান্তিময় ও সমৃদ্ধশালী করতে সদা সচেষ্ট থাকেন। মানবসভ্যতার ইতিহাসে নারীদের অসামান্য অবদানের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হলো নববী যুগের (রাসুলের সময়কার) নারীগণ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস চর্চায় নারীরা পুরুষের সাথে অংশগ্রহণ করে হাদীস সংগ্রহ করেছিলেন। এ ব্যাপারে পর্যালোচনা করে দেখা গেছে যে, সকল গুরুত্বপূর্ণ হাদীস সংগ্রাহক অনেক নারী থেকে হাদীস সংগ্রহ করেছেন। প্রতিটি প্রধান সংগ্রহে অনেক নারীর নাম রয়েছে। যারা শত বাধা, বহু ত্যাগ স্বীকার করে ইসলাম ও শান্তিপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠা এবং জ্ঞানচর্চায় অতুলনীয় কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। যার ফলে ইসলাম অতিদ্রুত পারিবারিক ও প্রান্তিক পর্যায়ে বিস্তৃত হতে সক্ষম হয়েছে। মানবসভ্যতায় নারীর অবদান নিয়ে আলোকপাত হলে আমাদের মনে হয় ১৮'শ শতকের পর থেকে হয়তো নারীরা সামাজিক ও জ্ঞানচর্চায় অবদান রাখার পাশাপাশি তা গ্রহণের অধিকার পেয়েছে। কিন্তু আমরা যদি ইসলাম প্রতিষ্ঠার শুরু সেই সময়ের দিকে থাকাই তাহলে দেখতে পাবো অসংখ্য নারী সামাজিক, রাজনৈতিক ও জ্ঞানচর্চার অধিকার পাওয়ার পাশাপাশি তাতে অসামান্য অবদানের স্বাক্ষর রেখে গিয়েছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পূর্বে তার স্ত্রীদের সাথে পরামর্শ করে নিতেন। এমনি রাসুল জীবনে যতগুলো যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন সবগুলো যুদ্ধে তার প্রিয় স্ত্রীদের সঙ্গে নিয়ে যেতেন এবং তাদের কাছ থেকে যুদ্ধের রণকৌশল সম্পর্কে আলোচনা করে অবগত হতেন।

ইসলামে নারীর মর্যাদা

ইসলাম নারীকে সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদায় ভূষিত করেছে। এই ধর্ম নারীকে যে সম্মান দিয়েছে তা কোন যুগে কোন কালে কোন ধর্ম ও কোন জাতি দিতে পারেনি। ইসলাম নারীকে পুরুষের সাথী হিসেবে নির্ধারণ করেছে। তাদের একজন অপরজন ছাড়া অচল। দু'জনই পরষ্পরের মুখাপেক্ষী। নারীর দৃষ্টিতে যে পুরুষ শ্রেষ্ঠ মানুষের মধ্যেও সেই সর্বোত্তম।

জাহিলিয়াত যুগে নারীদের না ছিল সম্মান না ছিল কোন মূল্য। এতটাই অবহেলিত আর নিকৃষ্টতর ভাবে নারীদের জীবন চলছিল। কিন্তু যখন আমাদের প্রিয় নবি (সা) এর আগমন ঘটে তখন থেকে আল্লাহ তার প্রেরিত রাসূলের মাধ্যমে নারীদের আসল সম্মান আব্রু ফিরিয়ে দিয়েছে। এভাবেই প্রতি পদে পদে আল্লাহ নারীদের করেছেন মহামূল্যবান। একজন মা, বোন, কন্যা, স্ত্রী হিসেবে প্রতি ক্ষেত্রে ইসলাম নারীদের দিয়েছেন আসল মর্যাদা। এরই ধারাবাহিকতায় নারীরাও হয়ে উঠেছে একেকজন বীরাঙ্গনা বীরমহিয়সী।

দ্বীন প্রচারে নারীদের ভূমিকা

দ্বীন প্রচার ও দ্বীনি শিক্ষা প্রসারে নারী পুরুষের মতোই অবদান রাখতে পারে।
পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, ‘মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী পরস্পরের অভিভাবক। তারা ভালো কাজের আদেশ দেয়, মন্দ কাজ থেকে বারণ করে, তারা নামাজ কায়েম, জাকাত প্রদান করে, আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করে। অতি শিগরির আল্লাহ তাদের প্রতি অনুগ্রহ করবেন। আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।’ (সুরা : তাওবা, আয়াত : ৭১)

রাসুলের যুগেও নারীরা জ্ঞানচর্চার মজলিসে অংশগ্রহণ করতেন এবং রাসুলের ইন্তেকালের পর তাঁর পুণ্যাত্মা স্ত্রীরা রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর মহান শিক্ষা প্রচার ও প্রসারে অসামান্য ভূমিকা রাখেন।

ইতিহাসের পাতায় ইসলাম প্রচারে বীরমহিয়সী নারীদের অবদান

হজরত মুহম্মদ (সা.) বলেন, ‘দুনিয়ার সব নারীর মধ্যে চারজন নারীর বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। তারা হলেন হজরত মরিয়ম (আ.), হজরত আসিয়া (আ.), হজরত খাদিজা (রা.) ও হজরত ফাতেমা (রা.)। এ ছাড়া ইসলামের ইতিহাসে আরও অসংখ্য নারী ছিলেন যারা জ্ঞানে, গুণে, সততা আর প্রজ্ঞায় এখনো সব নারীর জন্যই অনুপ্রেরণার উৎস। যুগে যুগে ইসলাম প্রচারে এদের ভূমিকা ছিল

মা হাজেরা আ.

ইসলামের যে বিশ্বজনীন ব্যবস্থা তার ভিত নির্মিত হয়েছে একজন মহিলার অবদানের উপর। ইতিহাস বলে, হযরত ইবরাহীম আ. দ্বিতীয় স্ত্রী হযরত হাজেরা আ. কে কোলের শিশু ইসমাঈলসহ রেখে এসেছিলেন জনমানবহীন মক্কার মরুপ্রান্তরে। ইব্রাহীম আ. বাস করতেন বর্তমান ফিলিস্তিনে। সেখান থেকে গিয়ে তিনি শিশু ইসমাইলকে মায়ের কোলে রেখে আসেন ঠিক সেই জায়গায়, যেখানে বর্তমানে কাবাঘর ও হেরেম শরীফ প্রতিষ্ঠিত। জনমানবহীন খাদ্য ও পানীয় শুন্য একটি মরুভূমিতে স্ত্রী ও দুগ্ধপোষ্য সন্তানকে রেখে আসা ইব্রাহীমের জন্য যতখানি অসহনীয় ছিল তার চেয়েও বিস্ময়কর ছিল হযরত হাজেরার এমন নির্বাসিত জীবন মেনে নেয়া। অথচ আল্লাহর আদেশ বলে তারা হাসিমুখে বরণ করে নেন যাবতীয় মানসিক ও দৈহিক কষ্ট। ইবরাহীম আ. এর প্রত্যয় ছিল যেহেতু এই কাজ আল্লাহর হুকুমে আঞ্জাম দিয়েছি বাকিটুকু তিনি দেখবেন।

একটি থলিতে রাখা খেজুর ও মশকের পানি ফুরিয়ে গেলে কোলের যাদুর প্রাণ নাশের আশংকায় হযরত হাজেরা অস্থির হয়ে যান। পানির সন্ধান পাবেন আশায় একবার সাফা পাহাড়ের উপর উঠেন, আবার মারওয়া পাহাড়ের দিকে দৌঁড়ে যান। মনে হয় পানি সাফা পাহাড়ের উপর টলমল করছে। আবার দৌঁড়ে সাফা পাহাড়ে গিয়ে নিরাশ হন। মনে হচ্ছে পানি মারওয়া পাহাড়ে ঝিলমিল করছে। আসলে মরুভূমির প্রখর রোদে মরিচিকার মায়াজালকে পানির অথৈ তরঙ্গ বলে ভ্রম হচ্ছিল। এভাবে হাজেরা আ. সাত বার দুই পাহাড়ের মাঝখানে দৌঁড়ান।

শেষবারে লক্ষ করেন, শিশুকে যেখানে রেখে পানির জন্য ছুটাছুটি করছেন সেখানে ইসমাঈলের পায়ের নিচ থেকে পানির ঝর্ণা উৎসারিত হচ্ছে। হাজেরা তাড়াতাড়ি সেই ঝর্ণার চারপাশে আল তুলে দেন। এই ঝর্ণাই বর্তমান যমযম কূপ। সেই কূপকে কেন্দ্র

করে মক্কায় জুরহুম সম্প্রদায়ের বসতি গড়ে উঠে। কাবাঘর নির্মিত হয়। হজের প্রবর্তন হয়। তখন থেকে যত নবী রাসূল দুনিয়াতে এসেছেন, যত আলেম ওলী এসেছেন, কিয়ামত পর্যন্ত আসবেন, প্রতি বছর লাখ লাখ হাজি হজ করেন, সারা বছর ওমরা করেন, তাদের সবাইকে মহিয়সী নারী বিবি হাজেরার অনুকরণ করতে হয়। তিনি যেভাবে দৌঁড়িয়েছেন সেভাবে সাফা মারওয়ায় সায়ী করতে হয়। তারপর মা হাজেরার স্মৃতিধন্য যমযমের পানি পান করে আমরা প্রাণ জুড়াই। ইসলামের প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় নারীদের ভূমিকার এর চেয়ে বড় উদাহরণ আর কী হতে পারে? আর নারীর প্রতি ইসলাম যে সম্মান দিয়েছে তা কি মানুষের কল্পনায় আসতে পারে?

মরিয়ম (আ.)

বিবি মরিয়ম বাইতুল মুকাদ্দাসের অদূরেই নাছেরা শহরের বাসিন্দা ছিলেন। পিতামাতার ইচ্ছানুযায়ী বাইতুল মুকাদ্দাসের খেদমতে নিযুক্ত হয়েছিলেন তিনি। বাল্যকাল থেকেই তিনি ছিলেন সুশীলা এবং ধর্মানুরাগী। তার পিতার নাম ছিল ইমরান এবং নবী জাকারিয়া (আ.)-এর শ্যালিকা বিবি হান্না ছিলেন তার জননী।

একদিন মরিয়ম নামাজ পড়ছিলেন, হঠাৎ ফেরেশতা জিব্রাইল অবতীর্ণ হয়ে বললেন, ‘তুমি আল্লাহর অনুগ্রহপ্রাপ্তা। আল্লাহ তোমার সঙ্গে আছেন।’

বিবি মরিয়ম এই অপ্রত্যাশিত সম্বোধনে ভীত হলেন। জিব্রাইল বললেন, ‘আমি আল্লাহর ফেরেশতা জিব্রাইল। তুমি ভীত হয়ো না; পবিত্র সন্তান লাভ করবে তুমি, এই সুসংবাদ তোমাকে দিতে এসেছি।’

মরিয়ম বললেন, ‘তা কেমন করে, আমি যে কুমারী।’

ফেরেশতা বললেন, ‘আল্লাহর কুদরতেই হবে এটি। তার কাছে এটি কঠিন কাজ নয়।’

এই বলে জিব্রাইল উধাও হলেন।

যথাসময়ে বিবি মরিয়ম গর্ভধারণ করলেন। কিন্তু কুমারী নারীর এভাবে গর্ভবতী হওয়ার ফলে সবাই তাকে বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে বের করে দিলেন। এমনকি তাকে স্বগ্রামও ছেড়ে যেতে হলো। বিপদাপন্ন মরিয়ম কোনো আশ্রয় খুঁজে না পেয়ে একটি শহরের দ্বারপ্রান্তে আস্তাবলের একটি পতিত জমিনে এক খেজুর গাছের নিচে আশ্রয় নিলেন এবং সঙ্গী-সহায়হীন অবস্থায় একটি পুত্রসন্তান প্রসব করলেন। এই পুত্র সন্তানই ছিলেন হযরত ঈসা (আ.)। আট দিন বয়সে সদ্যোজাত ঈসার ত্বক ছেদন করা হয়। মরিয়ম শুচি-স্নাতা হওয়ার পর সন্তান নিয়ে আবারও বাইতুল মুকাদ্দাসে ফিরে গেলেন।

এদিকে, মরিয়ম স্বপ্ন দেখলেন, সম্রাট হিরুইস এই সন্তানের শত্রু, সে তাকে হত্যা করতে চায়। সে যেন শিশুকে নিয়ে মিসরে চলে যায়। মরিয়ম তার সন্তান নিয়ে মিসরে রওনা হয়ে যান। হিরুইস যত দিন জীবিত ছিল, ততদিন সন্তান নিয়ে তিনি মিসরেই অবস্থান করেন। হিরুইসের মৃত্যুর পর তিনি নিজ দেশ নাছেরায় ফিরে আসেন।

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঈসার মধ্যে প্রখর জ্ঞান এবং তীক্ষ্ম মেধাশক্তির পরিচয় ফুটে উঠল। আল্লাহর বিশেষ একটি অনুগ্রহ যে তার ওপর রয়েছে, দিন দিন তা প্রকাশ পেতে শুরু করল। ক্রমান্বয়ে হযরত ঈসা আধ্যাত্মিক জ্ঞানের পূর্ণতা লাভ করতে লাগলেন। ত্রিশ বছর বয়সে তিনি আল্লাহর কাছ থেকে ‘ওহি’ লাভ করেন এবং নবীরূপে ধর্মপ্রচার করতে শুরু করেন।

বিবি আসিয়া (আ.)

অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট ও নির্যাতন সহ্য করেও ন্যায়ের পথে অবিচল থাকার জ¦লন্ত প্রমাণ বিবি আসিয়া (আ.)। দুনিয়ার আরাম-আয়েশকে পদাঘাত করে আল্লাহর ভালোবাসাকে প্রধান্য দিয়েছেন তিনি।

আসিয়া (আ.)-এর কোলে লালিতপালিত হন আল্লাহর প্রিয় নবী হজরত মুসা (আ.)। শিশু মুসাকে যখন তার মা ফেরাউনের ভয়ে সিন্দুকে ভরে নীল নদে নিক্ষেপ করেন, তা ভাসতে ভাসতে সেই ফেরাউনের ঘাটে গিয়েই ঘুরপাক খেতে থাকে। পাপিষ্ঠ ফেরাউন সিন্দুকটি উঠানোর চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। তার অপবিত্র হাতে তা উঠছিল না।

কিন্তু বিবি আসিয়া যখন আল্লাহর নামে তা ওঠানোর জন্য হাত দেন, সঙ্গে সঙ্গে তা উঠে আসে। সিন্দুক খুলে একটি পুত্রসন্তান দেখে ফেরাউনের মনে সন্দেহ সৃষ্টি হয় এবং তাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়। কারণ ফেরাউন গণকদের কাছ থেকে জানতে পেরেছিল, ইসরাইল বংশে এক শিশুপুত্র জন্ম নেবে, যার হাতে তার রাজত্ব ধ্বংস হবে। কিন্তু তার স্ত্রী আসিয়া (আ.) শিশুটিকে লালন পালনের আগ্রহ ব্যক্ত করে বলেন, 'এ শিশু আমার ও তোমার নয়নমণি, তাকে হত্যা করো না।' স্ত্রীর দাবির সামনে ফেরাউন নমনীয় হয়।

আল্লাহ তায়ালা হজরত আসিয়া (আ.)-এর অন্তরে শিশু মুসা (আ.)-এর প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করে দেন। তিনি তাকে নিজ ছেলের মতো ভালোবাসতে থাকেন।

হজরত আসিয়া (আ.) ছিলেন মিসরের অধিবাসী মুজাহিমের মেয়ে। তার বাবা তাকে মিসরের ফেরাউন (বাদশাহ) দ্বিতীয় রামসেসের সঙ্গে বিয়ে দেন। ফেরাউন ছিল অত্যন্ত প্রতাপশালী ও কুখ্যাত। নিজেকে তিনি খোদা বলে দাবি করতেন। কিন্তু আসিয়া (আ.) ফেরাউনের ভ্রান্ত দাবি, বিশ্বাস ও স্বৈরাচার নীতিকে প্রত্যাখ্যান করেন। এতে ফেরাউন তার ওপর ভীষণ ক্ষিপ্ত হয়। আসিয়ার ওপর নেমে আসে জুলুম-নির্যাতন। ফেরাউনের নির্দেশে তাকে জিঞ্জিরে বেঁধে রাখা হয়, বিরাট পাথরের নিচে তাকে চাপা দিয়ে রাখা হয়। পাথরের আঘাতে তার পবিত্র দেহ ক্ষতবিক্ষত হয়। এমনকি তার চোখও উপড়ে ফেলা হয়। কিন্তু এসব অমানবিক নির্যাতনেও আসিয়ার বিশ্বাসকে চুল পরিমাণ টলানো সম্ভব হয়নি।

হজরত খাদিজা (রা.)

আরবের কোরাইশ বংশের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন হজরত খাদিজা (রা.)। তারপরও অত্যন্ত সাধারণ জীবন-যাপন করতেন তিনি। ইসলাম আবির্ভাবের আগে তিনি ইব্রাহিম (আ.)-এর ধর্মে বিশ্বাস করতেন। তৎকালীন সমাজে সৎকর্ম ও দানশীলতার ক্ষেত্রে হজরত খাদিজার সমকক্ষ কেউ ছিলেন না। বিজ্ঞ ও সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গির খাদিজা ছিলেন হিজাজের অন্যতম বড় ব্যবসায়ী। আধ্যাত্মিকতার প্রতি ঝোঁক

ছিল তার। জানা যায়, তিনি সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আবির্ভাবের অপেক্ষায় ছিলেন এবং তিনি আরবের সচেতন ও শিক্ষিত প্রবীণদের কাছে শেষ নবীর নিদর্শন সম্পর্কে মাঝেমধ্যেই জিজ্ঞাসাবাদ করতেন। কিন্তু নবুয়তপ্রাপ্তির আগেই রাসুল (সা.)-এর সঙ্গে পরিচয় ঘটে খাদিজার। তিনি বুঝতে পারলেন, সমাজের অতুলনীয় ও পবিত্রতম পুরুষ হচ্ছেন মুহাম্মদ (সা.)। রাসুলের গুণাবলি তাকে আকৃষ্ট করে। এরপরই ৪০ বছর বয়সে তিনি ২৫ বছরের রাসুলকে বিয়ের প্রস্তাব পাঠান। শুরু হয় তাদের দাম্পত্য জীবন। এই বিয়েকে তৎকালীন সমাজ স্বাভাবিকভাবে নেয়নি। সম্পদহীন মুহম্মদ (সা.)-কে বিয়ে করায় অনেকেই তাকে তাচ্ছিল্য করতেন। কুরাইশ বংশের এক দল অহংকারী ও নিন্দুক মহিলা তাকে গরিব মুহাম্মদের প্রসঙ্গ টেনে কটাক্ষ করত। তিনি উত্তর দিতেন, 'তার মতো আর কেউ কি আছে? তার মতো সচ্চরিত্রবান ও মর্যাদাবান দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তিকে কি তোমরা চেনো?' ওইসব মহিলার বিদ্বেষমাত্রা এত বেশি ছিল যে, খাদিজার সন্তান প্রসবের সময় বিন্দু পরিমাণ সহযোগিতাও কেউ করেনি।

ইসলাম গ্রহণের পর সমগ্র অস্তিত্ব দিয়ে তিনি ইসলাম প্রতিষ্ঠার কাজে নিয়োজিত হন। ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য তার সকল সম্পদ রাসুলকে উপহার দিয়েছিলেন। শোয়াবে আবু তালিব নামক উপত্যকায় মুসলমানরা যখন বিচ্ছিন্ন ও অবরোধের শিকার হয়েছিল, তখন তার আর্থিক সহযোগিতা মুসলমানদের টিকে থাকতে সহায়তা করেছিল। কোনো কারণে রাসুল (সাঃ)-এর মন খারাপ থাকলে তিনি পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার উদ্যোগ নিতেন এবং সকল কাজে পরামর্শ দিতেন।

মুসলমানদের ওপর অবরোধ আরোপের পর খাদিজা (রা.) অনেক কষ্ট সহ্য করেছেন। এত সম্পদের মালিক হয়েও তিনি দীর্ঘদিন শুষ্ক এক উপত্যকায় কষ্টের মধ্যে জীবনযাপন করেছেন। ইসলামের জন্য তার অঢেল সম্পদ বিলিয়ে দিয়েছিলেন। ওই উপত্যকায় কষ্টের মধ্যে জীবনযাপন করার কারণে খাদিজার স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে। তিনি মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়েন। এর ফলেই তার মৃত্যু ত্বরান্বিত হয়। ইসলামের এই মহীয়সী নারী ৬১৭ খ্রিস্টাব্দের ১০ রমজান ৬৫ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।

হজরত ফাতেমা (রা.)

ইসলামের নবী হজরত মুহাম্মদ (সা.) এবং তার প্রথম স্ত্রী খাদিজার মেয়ে ছিলেন ফাতিমা বিনতে মুহাম্মদ। সারা বিশ্বের মুসলমানরা তাকে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে। মক্কায় কোরাইশদের দ্বারা মুহাম্মদ (সা.)-এর ওপর নির্যাতন ও দুর্দশার সময়ে সব সময়ই ফাতেমা তার পাশে ছিলেন। ফাতেমা মহানবী (সা.)-এর মেয়ে হয়েও স্নেহময়ী মায়ের মতো মহানবীকে ভালোবাসতেন বলেই তার উপাধি হয়েছিল 'উম্মে আবিহা'। এর অর্থ 'তার পিতার মা'। মহান আল্লাহর নির্দেশে হিজরতের সময় হজরত ফাতেমাও নবী পরিবারের অন্যদের সঙ্গে হিজরত করেন। তিনি ছিলেন খোলাফায়ে রাশেদিনের চতুর্থ খলিফা ইসলামের বীর সৈনিক হজরত আলী (রা.)-এর প্রিয়তমা স্ত্রী এবং ইসলামের ইতিহাসের শ্রেষ্ঠতম শহীদ হজরত ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইনের মা।

ফাতেমা (রা.)-এর মা খাদিজা (রা.) মারা যাওয়ার সময় প্রচুর ধন-সম্পদ রেখে যান। মহীয়সী মায়ের মতো তিনিও সকল ধন-সম্পদ ইসলাম প্রচারের জন্য তার বাবার হাতে তুলে দেন। বদান্যতা, মহানুভবতা ও দরিদ্রদের প্রতি তার মমতা এতই বেশি ছিল যে, কোনো অসহায় বা ভিক্ষুক কখনোই কিছু না পেয়ে তার ঘরের দরজা থেকে খালি হাতে ফিরে যায়নি।

প্রিয় নবী হজরত মুহাম্মদ (স.)-এর চরিত্রের প্রতিটি গুণই তার জীবনে প্রতিফলিত হতে দেখা গেছে। তিনি ছিলেন সত্যের পূজারী, আমানতদারী, লাজুক, নম্র ও সরলমনা। শৈশব থেকেই হজরত ফাতেমা ছিলেন নির্ভীক, তেজস্বিনী ও বক্তা। তিনি সর্বদা তার বাবা হজরত মুহাম্মদ (স.)-এর আদর্শ অনুসরণ করতেন এবং মা বিবি খাজিদা (রা.)-এর আদেশ ও উপদেশাবলি বাস্তব জীবনে পালন করতেন। তার জন্ম সম্পর্কে নানা মতভেদ রয়েছে। তিনি ৬০৫ খ্রিস্টাব্দে মতান্তরে ৬০৪ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। বলা হয়ে থাকে, প্রথম কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার পাঁচ বছর পর কাবাঘর সংস্কারের সময় জন্মগ্রহণ করেন। হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মৃত্যুর কয়েক মাস পরেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন এবং মদিনার জান্নাতুল বাকিতে তাকে সমাধিস্থ করা হয়। হজরত ফাতেমার মর্যাদা সম্পর্কে মহানবী (সা.) বলেন, 'দুনিয়ার সব নারীর ওপর চারজন নারীর মর্যাদা রয়েছে। তারা হলেন হজরত মরিয়ম (আ.), হজরত আসিয়া (আ.), হজরত খাদিজা

(রা.) ও হজরত ফাতিমা (রা.)। পবিত্র কোরআনের অনেক আয়াতে হজরত ফাতেমার (রা.) মর্যাদার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

হজরত আয়েশা (রা.)

আয়েশা বিনতে আবু বকর (রা.) ছিলেন নবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর স্ত্রী। নবীজির খুব প্রিয় স্ত্রী ছিলেন আয়েশা। মুসলিম সম্প্রদায় তাকে নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর স্ত্রী হিসেবে অত্যন্ত সম্মান ও শ্রদ্ধা করে থাকেন। ইসলামের ঐতিহ্য অনুসারে, তাকে 'উম্মুল মুমিনিন' বা 'বিশ্বাসীদের মাতা' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। এ ছাড়া ইসলামের ঐতিহ্যগত ইতিহাসেও তার অবদান অনস্বীকার্য এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ইসলামি জ্ঞানবিজ্ঞানে হজরত আয়েশা (রা.) ছিলেন নজিরবিহীন। কোরআন-হাদিসের জ্ঞান এবং ইসলামি শরিয়তের মাসলা-মাসায়েলের ব্যাপারে তিনি ছিলেন নারীদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়। প্রাচীন আরবের অবস্থা এবং প্রাচীন আরবি কাব্য সম্পর্কে তার অসাধারণ বুৎপত্তি ছিল। নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর সঙ্গে ছয় বছর বয়সে মতান্তরে নয় বছর বয়সে তার বিয়ে হয়। নবীজির স্ত্রীদের মধ্যে তিনি ছিলেন সবচেয়ে ছোট বয়সের। মৃত্যুর সময় মুহাম্মদ (সা.) তার ঘরেই ছিলেন এবং তার এই প্রিয়তমা স্ত্রীর বাহুযুগলে মাথা রেখেই মহানবী (সা.) শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

নবী (সা.)-এর মৃত্যুর পর জনগণ আবু বকর (রা.)-কে খলিফা নির্বাচন করেন। তখন আয়েশা (রা.) নবী (সা.)-এর স্ত্রী এবং খলিফার মেয়ে হিসেবে সমধিক সম্মান পেতেন। আবু বকর (রা.) তার মৃত্যুর আগে ওমর (রা.)-কে খলিফা নিযুক্ত করে যান। খলিফা ওমর (রা.)-এর শাসনামলেও তিনি দাপটের সঙ্গে রাজনৈতিক সিদ্ধান্তসমূহে মতামত প্রদান করার স্বাধীনতা লাভ করেছিলেন। ইসলামের ইতিহাসে বসরার যুদ্ধ বা উটের যুদ্ধ নামে পরিচিত যুদ্ধে তিনি পেছন থেকে নেতৃত্ব দেন। ইতিহাসে এ যুদ্ধের প্রভাব ছিল ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী। তিনিই ছিলেন একমাত্র নারী যিনি সামনে থাকা অবস্থায় হজরত মুহাম্মদ (সা.) কাছে ওহি অবতীর্ণ হয়েছিল। ইসলামের প্রথম খলিফা আবু বকর (রা.) ছিলেন তার বাবা। আয়েশা (রা.) ৬১৩ খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে মতান্তরে ৬১৪ খ্রিস্টাব্দের প্রথম দিকে জন্মগ্রহণ করেন। রোগে আক্রান্ত হয়ে ৫৮ হিজরি সনের

১৭ রমজান (১৬ জুলাই, ৬৭৮ খ্রিস্টাব্দ) মৃত্যুবরণ করেন। তাকে দাফন করা হয় জান্নাতুল বাকিতে। তার মাতার নাম উম্মে রুমান।

হাবশায় হিজরতে মহিলাদের অবদান

সাধারণ মুসলিম মহিলারাও দ্বীনী দায়িত্ব পালনে যে ভূমিকা পালন করেছেন তা অনেক বিস্তৃত ও গৌরবজনক। নবুয়াতের ৫ম বর্ষে মক্কায় যখন মুশরিকদের আত্যাচার নির্যাতন চরম আকার ধারণ করেছিল তখন নবীজির আদেশে দুই দফায় মুসলমানরা হাবশায় হিজরত করেন। দেখা যায় দেশত্যাগের কঠিন কষ্ট যারা মাথায় নিয়েছিলেন তাদের মধ্যে বিশ জনের মত ছিলেন মহিলা। ইসলামের জন্যে প্রথম যুগের মুসলিম মহিলাদের এই আত্মত্যাগ প্রমাণ করে যে কোনো পরিস্থিতিতে ইসলামের জন্য ত্যাগ স্বীকার করতে মুসলিম মহিলারা পিছপা হন নি।

মক্কায় মজলুম পাঁচ কৃতদাসী

আবু বকর সিদ্দিক রা. মক্কায় যারা আল্লাহর পথে আসার কারণে নির্যাতিত হচ্ছিল তাদের মধ্যে সাতজন পুরুষ ও পাঁচজন মহিলাকে মুক্তি দান করেন। পুরুষদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন বেলাল ইবনে রেবাহ ও আমের ইবনে ফাহির, যাকে গারে সৌরে আত্মগোপন অবস্থায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গুহায় আসা যাওয়ার ব্যাপারে নিজের জন্য নিরাপদ মনে করেছিলেন। তিনি মদীনায় হিজরত করেন এবং বী’রে মাউনার হত্যাকা-ের সময় তিনি শাহাদত বরণ করেন। পাঁচজন মহিলার মধ্যে ছিলেন হযরত নাহদিয়া ও তাঁর মেয়ে, উম্মে উমাইস ও বনি আমর ইবনে মুআম্মাল এর দাসী ও যুনাইরা। বর্ণিত আছে, যুনাইরা ছিলেন দুর্বল দৃষ্টিশক্তির একজন মহিলা। তিনি ইসলাম গ্রহণের পর শায়বা ইবনে রাবিয়া, উতবা ইবনে রাবিআ ও উমাইয়া ইবনে খালাফ প্রমূখ কুরাইশ নেতা দলবলসহ তাকে নিয়ে হাসিঠাট্টা করত। তাকে বসিয়ে নানা কথা বলে হাসাহাসি করত। তারা বলত যে, আল্লাহর কসম, মুহাম্মদ যে ধর্ম নিয়ে এসেছে তা যদি ভাল হত তাহলে যুনাইরা আমাদের পেছনে ফেলে সেদিকে যেতে পারত না। এ মর্মে কুরআনের একটি আয়াত নাযিল হয়। এক সময় যুনাইরার দৃষ্টিশক্তি সম্পূর্ণ চলে গেল। তখন কুরাইশের নেতারা বলতে লাগল, তুমি লাত ও ওজ্জার ধর্মের বিরোধীতা করেছ; এ জন্যে লাত ও ওজ্জা তোমার দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নিয়েছে। যুনাইরা

তাদের জবাবে বলতেন, না, আল্লাহর কসম, তারা আমার কোনো ক্ষতি করে নি এবং আমার কোনো ক্ষতি করার শক্তি ওদের নাই। পরবর্র্তীতে আল্লাহ তাআলা তার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।

রাবেয়া বসরী (রহ.)

ইরাকের বসরা নগরীতে এক দরিদ্র পল্লীতে জন্ম হয়েছিল হজরত রাবেয়া বসরীর (রহ.)। দরিদ্র হলেও তার পরিবার ছিল অত্যন্ত সম্মানিত। বাবার নাম ইসমাঈল ও মায়ের নাম মায়ফুল। প্রখর বুদ্ধিমত্তার অধিকারিণী ছিলেন তিনি। সব সময় গভীর চিন্তায় ধ্যানমগ্ন হয়ে যেতেন। তার জন্মতারিখ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। তবে বলা হয় ৭১৯ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে এই মহীয়সী নারী জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

কথিত আছে, তার বাবা এতই দরিদ্র হয়ে পড়েছিলেন, যে রাতে রাবেয়া বসরী (রহ.) জন্মগ্রহণ করেন, তখন ঘরে বাতি জ্বালাবার তেল এবং প্রসূতি ও সন্তানের পেটে মালিশ করার তেল পর্যন্ত ছিল না। রাবেয়ার আগে তার বাবার আরও তিনটি মেয়ে হয়েছিল। তিনি চতুর্থ নম্বর বলে তার নাম রাবেয়া রাখা হয়। আরবি ভাষায় রাবেয়া শব্দের অর্থ চতুর্থা। রাবেয়া বসরী (রহ.) মা-বাবার কাছ থেকে কোরআন, হাদিস ও অন্যান্য ধর্মীয় গ্রন্থের শিক্ষা লাভ করেছিলেন। তিনি কখনো কারও মুখাপেক্ষী ছিলেন না। সব সময় তিনি আল্লাহর ওপর ভরসা করতেন। তিনি একটি ইবাদতখানা নির্মাণ করে সেখানে নীরবে দিন-রাত ইবাদতে রত থাকতেন। আল্লাহর একজন প্রকৃত ওলি হওয়ার জন্য যা যা গুণাবলি থাকা প্রয়োজন সকল গুণের অধিকারিণী ছিলেন হযরত রাবেয়া বসরী (রহ.)। সে সময় স্বনামধন্য অনেক সুফি রাবেয়া বসরীর (রহ.) কাছে ইসলাম নিয়ে আলোচনা করার জন্য আসতেন। রাবেয়া বসরী দাসত্বের জীবনও অতিবাহিত করেছেন। বিরামহীন ভাবে সারা দিন কাজ করে আল্লার ইবাদতে মশগুল হয়ে যেতেন। রাবেয়া বসরীর উদ্দেশ্যই ছিল আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভ করা। রাবেয়া বসরীর ইবাদত-বন্দেগি দেখে তার মনিব তাকে দাসত্ব জীবন থেকে মুক্ত করেন।

একবার মুনাজাতের সময় তিনি বলছিলেন ‘হে আল্লাহ। যদি জান্নাতের লোভে ইবাদত করি তাহলে আমি যেন কখনোই জান্নাতে না যাই আর যদি জাহান্নামের ভয়ে ইবাদত

করি তাহলে যেন আমি জাহান্নামে যাই। কিন্তু আল্লাহ আমি যদি শুধু তোমাকে ভালোবেসে তোমার ইবাদত করি তাহলে আমি যেন কখনোই তোমার দর্শন থেকে এক মুহূর্ত বঞ্চিত না হই।' এই মহীয়সী নারী ৮০১ খ্রিস্টাব্দে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

রাষ্ট্রপ্রধানের উপদেষ্টা উম্মে সালমা (রা)

উম্মহাতুল মুমেনীনদের মধ্যে

জাতীয় জীবনের জটিল সমস্যা সমাধানে যে ভূমিকা পালন করেছিলেন তার কারণে তাকে ইসলামে রাষ্ট্রপ্রধানের উপদেষ্টার মর্যাদায় স্মরণ করা হয়। নবীজি মক্কা অভিযানের উদ্দেশ্যে ১৪০০ সাহাবীর বিরাট বাহিনী নিয়ে মদীনা থেকে মক্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন। হুদায়বিয়া নামক স্থানে পৌঁছে তিনি জানতে পারেন কুরাইশরা তাকে মক্কা প্রবেশ ও উমরা পালন করতে দেবে না। তিনি আলোচনার জন্য মক্কার ধনাঢ্য ব্যক্তি হযরত উসমানকে পাঠান। ঘটনা প্রবাহের মধ্য দিয়ে কুরাইশদের সাথে শান্তিচুক্তি হয়। কিন্তু বাহ্যত এই চুক্তি ছিল মহানবী ও মুসলমানদের জন্য অবমাননাকর। শান্তির স্বার্থে ও ভবিষ্যতের বৃহত্তর সুফলের আশা নিয়ে নবীজি এই চুক্তি স্বাক্ষর করেন। চুক্তির শর্ত ও চুক্তি স্বাক্ষরকালে মক্কার মুশরিকদের ঔদ্ধত্বপূর্ণ আচরণে মুসলমানরা ভীষণ ক্ষিপ্ত ছিল। বিপুল সংখ্যক জানবাজ যোদ্ধা সঙ্গে থাকা সত্ত্বেও মহানবীর পক্ষ হতে মুশরিকদের অযৌক্তি সব শর্ত মেনে নেয়াকে সহজভাবে মেনে নিতে পারছিল না, হযরত উমর রা. এর মত বিশাল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন সাহাবীও। শেষ পর্যন্ত চুক্তি স্বাক্ষর হল। শর্ত অনুযায়ী মুসলমানরা উমরা পালন না করেই ফেরত যাবে। মক্কার হেরেমে কুরবানীর জন্য যেসব পশু তারা সাথে এনেছিল সেগুলো হুদায়বিয়াতেই যবাই করতে হবে। এখানেই উমরার ইহরাম খুলতে হবে। নবীজি সাহাবীদের উদ্দেশ্যে ঘোষণা দিলেন, তোমরা কুরবানীর পশু জবাই কর। মাথার চুল ছেঁটে ফেল। ইহরাম খুলে স্বাভাবিক হয়ে যাও। কিন্তু আশ্চর্য যে, যারা নিজের জান বাজি রেখে হযরতের নির্দেশে প্রাণ দিতে হুদাইবিয়া প্রান্তর পর্যন্ত এসেছেন, তারা এখন হযরতের আদেশ পালনে তৎপর হচ্ছেন না। নবীজি তার আদেশটি তিনবার ঘোষণা করলেন। কিন্তু কেউ আদেশ পালনে অগ্রসর হয় না। এ অবস্থা দেখে নবীজি চিন্তিত মনে তাঁবুতে ঢুকে উম্মে সালামাকে লোকদের অবস্থার কথা জানালেন। নেতৃত্বের আনুগত্য ও প্রশাসনিক দৃষ্টিকোণ থেকে এর চেয়ে গভীর ও জটিল সংকট আর কিছু হতে পারে না। এই সংকট সমাধানে প্রচ- আত্মবিশ^াস

নিয়ে এগিয়ে এলেন নবীজির যোগ্য সহধর্মীনী আমাদের মা উম্মে সালামা। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি চান যে তারা আপনার আদেশ পালন করুক। তাহলে আপনি তাদের কারো সাথে একটি কথাও বলবেন না। শুধু সবার সামনে গিয়ে আপনার উটনীটি নহর (জবাই) করুন। তারপর আপনার নাপিতকে ডেকে আপনার মাথা মু-নোর ব্যবস্থা করুন। এই পরামর্শ পেয়ে নবীজি তাঁবু হতে বের হলেন এবং কারো সাথে কোনো কথা না বলে নিজের উটনী নহর করলেন। তারপর নাপিত ডেকে মাথা মু-ন করলেন। লোকেরা যখন এই দৃশ্য দেখল, সবাই তাদের কুরবানীর পশু নহর করল। একজন আরেকজনের মাথা মু-ন শুরু করল। এতক্ষণ তারা ভাবছিল যে, মুশরিকদের সাথে দৃশ্যত অবমাননাকর চুক্তি হয়ত পুনর্বিবেচনা হবে, পশু জবাই ও মাথা মু-নের জন্য নবীজির আদেশ পালনে তাই তারা ইতস্তত করছিল। কিন্তু যখন প্রমাণ হল যে, নবীজি তাঁর সিদ্ধান্ত ও আদেশের ব্যাপারে অবিচল তখন তারা সেই আদেশ পালনে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। বস্তুত জাতীয় জীবনের সমস্যা সমাধানে হযরত উম্মে সালমার এই বিচক্ষণতা ও ভূমিকা মুসলিম মহিলাদের জন্য সামাজ ও জাতীয় জীবনের সমস্যা সমাধানে অবদান রাখতে আলোকবর্তিকা হিসেবে কাজ করছে।

যুবায়দা (রা.)

১৮৬ হিজরিতে খলিফা হারুনুর রশীদের স্ত্রী বিবি যুবায়দা হজ পালনকালে মক্কায় হাজিদের পানির কষ্ট দেখতে পান। তখন তিনি পাহাড়ের জলপ্রপ্রাত থেকে মক্কা শহর পর্যন্ত খাল কাটার নির্দেশ দেন। তার একক প্রচেষ্টায় ও ব্যক্তিগত খরচে প্রায় সাড়ে ষোল কিলোমিটার লম্বা খাল খনন করা হয় এবং সেখান থেকে বিভিন্ন পয়েন্টে হাজি ও মুসাফিরদের পানির যাবতীয় প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা করা হয়। বলা হয়ে থাকে, মক্কা থেকে তায়েফমুখী এই খাল খননকার্যে বিবি যুবায়দা আনুমানিক ৫৯৫০ কিলোগ্রাম স্বর্ণ খরচ করেছিলেন। ইতিহাসে এটি ‘উয়ুন যুবায়দা’ বা ‘বিরকাতে যুবায়দা’ হিসেবে প্রসিদ্ধ এবং ১২০০ বছর পরও এখান থেকে সেচপ্রকল্প অব্যাহত আছে।

হাফসা (রা.)

পশুর চামড়া ও হাড়ের ওপর লিখিত কোরআনের প্রথম পাণ্ডুলিপি হজরত ওমরের (রা.) কন্যা হাফসার (রা.) কাছে সংরক্ষিত ছিল। ইসলামি খেলাফতের অধীন বিভিন্ন

প্রদেশে কোরআনের ছয়টি অপ্রামাণ্য সংকলন প্রচলিত ছিল। হজরত হাফসার (রা.) কাছে কোরআনের প্রামাণ্য পান্ডুলিপি সংরক্ষিত থাকায় খলিফা উসমানের (রা.) পক্ষে অপ্রামাণ্য সংস্করণগুলো ধ্বংস করে ফেলা সম্ভব হয়েছিল। এই ঘটনা থেকে হাফসার (রা.) যোগ্যতা ও নৈতিক অবস্থান কতটা নির্ভরযোগ্য ছিল তা অনুমান করা যায়। তিনি কিন্তু রাসুলের স্ত্রীও ছিলেন।

খন্দক যুদ্ধে সাফিয়্যা (রা)

খন্দক যুদ্ধে ইহুদিরা মুসলমানদের সাথে সম্পাদিত চুক্তি ভঙ্গ করে মুশরিকদের সাথে মিলিত হয়। তারাও একযোগে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। যুদ্ধের এক পর্যায়ে বনু কুরাইজা মুসলিম নারী ও শিশুদের মধ্যবর্তী এমন কোন মুসলিম সৈন্যদল ছিল না যারা মহিলাদের নিরাপত্তা দেবে। এমন সময় এক ইহুদি মহিলাদের কেল্লার নিকট চলে আসে। আশংকা ছিল, যদি সে মহিলাদের কথা বনু কুরাইজাকে গিয়ে বলে আসে তারা ময়দান ফাঁকা পেয়ে মহিলাদের ওপর হামলা করবে। রাসুলুল্লাহ সাঃ এর ফুফু ও যুবাইর রা. এর মা হযরত সাফিয়্যাহ রা. হযরত হাসসান রা. - কে সেই ইহুদিদের হত্যা করতে বলেন। কিন্তু তিনি অপারগতা প্রকাশ করেন। পরিশেষে সাফিয়্যাহ রা. নিজেই তাঁবুর একটি খুটি নিয়ে নেমে আসেন এবং তা নিক্ষেপ করে ইহুদিকে হত্যা করেন। ইতিহাসবিদ ইবনুল আসির জাযারি রহ. লিখেছেন, কোন মুসলিম নারী কর্তৃক কোন কাফিরকে হত্যা করার এটিই প্রথম ঘটনা।

উম্মে উমারা রা.

উম্মে উমারা রা. একজন প্রসিদ্ধ সাহাবিয়া। মদিনার একদল মুসলমান হিযরতের পূর্বে কুরাইশের কাফিরদের থেকে লুকিয়ে আকাবারে রাসুলুল্লাহ সাঃ এর হাতে ইসলাম প্রচার প্রসার ও তার সাহায্যের বাইয়াত গ্রহন করেছিলেন। এটি ছিল মদিনা থেকে আগত মুসলমানদের সর্বপ্রথম দল। এই ছোট্ট দলটিতে উম্মে উমারা রা.ও ছিলেন। ইসলামের ইতিহাসে এটি ' বাইয়াতে আকাবা ' নামে প্রসিদ্ধ।

পরবর্তী ' বাইয়্যাতে রিদওয়ান' নামক বাইয়াতেও শরিক ছিলেন। এছাড়াও স্বামী যাইদ বিন আসিম রা.এর সাথে উহুদের যুদ্ধে, হযরত আবু বকর রা. এর যুগে ইয়ামামার

এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধেও অংশগ্রহন করেন। ইয়ামামার যুদ্ধে উম্মে উমারা রা. দেহের বারোটি স্থানে আঘাতপ্রাপ্ত হন। (আল - ফুতুহাতুল ইসলামিয়্যাহ: ১/১১)

হযরত উমার রা. এর খুতবায় প্রতিবাদ করলেন যে নারী

নারী পুরুষের সম্মিলিত প্রয়াসে ইসলাম দেশে দেশে বিজয় ও বিস্তার লাভ করেছে। ইসলামের স্বর্ণালী যুগে কখনো মহিলাদেরকে অন্তপুরের অবরোধবাসীনী হয়ে নির্বিকার করে রাখা হয় নি। সমাজ জীবনে তাদের সক্রিয় ভূমিকার একটি উদাহরণ হযরত উমর রা. এর খেলাফতকালের একটি ঘটনা। হযরত উমর রা. মসজিদে খুতবা দিচ্ছিলেন। মহিলাদের নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিলেন। সামাজিক শান্তি ও স্থিতিশীলতার জন্য বিয়েকে সহজ করার পরামর্শ দিচ্ছিলেন। বলছিলেন যে, বিয়েকে সহজ করতে হলে বিরাট অঙ্কের মোহরানার প্রবণতা ছাড়তে হবে। জুমার নামাযে উপস্থিত একজন মহিলা দাঁড়িয়ে গেলেন। খলিফার বক্তৃতার প্রতিবাদ করে বললেন, কুরআন মাজিদে আল্লাহ তাআলা মহিলাদেরকে বিরাট অঙ্কের মোহরানার ব্যবস্থা রেখেছেন। কাজেই আল্লাহ যেখানে আমাদেরকে বিরাট অঙ্কের মোহরানা দেয়ার কথা বলেছেন সেখানে তা কেড়ে নেয়ার আপনি কে? চিন্তা করা যায়, ভরা মসজিদে খলিফার ভাষণের সরাসরি প্রতিবাদ করছেন একজন মহিলা। বিশেষজ্ঞগণ এই ঘটনাকে মুসলিম মহিলাদের পার্লামেন্ট সদস্য হওয়ার পক্ষে দলীল হিসেবে উপস্থাপন করেন। সমাজের বৃহত্তর আঙ্গিনায়, জাতীয় জীবনে, সাহিত্য সংস্কৃতিতে, শিক্ষা ও চিকিৎসায় এমনকি যুদ্ধের ময়দানে মুসলিম মহিলাদের অবদান ইতিহাসের পাতায় চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছে। ইসলাম প্রতিষ্ঠায় সকল নারীর অবকদানকে আমরা শ্রদ্ধারসাথে স্মরণ করছি।

ইরামুক ও কাদিসিয়ার রণাঙ্গনে নারী

হযরত উমার ফারুক রা. এর যুগে আরব উপদ্বীপের বাইরে দুই পরাশক্তি দুই দল ছিল রোম ও পারস্য। রোমক ও পারসিকদের ইরামুক ও কাদিসিয়ান যুদ্ধে মহিলাদের কী পরিমান উদ্দীপনা ছিল তা নিম্নোক্ত বর্ণনা থেকে বোঝা যায়। ' নাখা গোৎত্রের জনৈক বৃদ্ধা নিজ সন্তানদেরকে রণাঙ্গনে প্রেরণ করার সময় বলেছিলেন -

' প্রিয় সন্তানেরা, তোমরা ইসলাম গ্রহণ করে তার ওপর অটল থেকেছ। হিযরত করে আর স্বদেশ ফিরে যাওনি। তবুও পৃথিবী তোমাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে যায়নি; তোমাদের গ্রাস করেনি দুর্ভিক্ষও। এবার তোমরা বৃদ্ধা মাকে সঙ্গে এনে তাকেও পারস্যাবাসীর মুখোমুখি করে দিয়েছ। আল্লাহর শপথ, তোমরা একই মা বাবার সন্তান। আমি তোমাদের বাবার সাথে খেয়ানত করিনি, অপমানিত করিনি তোমাদের মামাকে। যাও, যুদ্ধ শেষ হওয়া পর্যন্ত বিরতিহীনভাবে লড়াই করো।' (তারিখে তাবারি: ৩/৫৪৪)

অন্যান্য যারা

এছাড়াও ইসলামের ইতিহাসে জানা যায়, হুদায়বিয়ার সংকটে হজরত মুহাম্মদ (সা.) উম্মে সালমার (রা.) পরামর্শ গ্রহণ করেছিলেন।

অষ্টম শতাব্দীর স্কলার ফাতেমা আল বাতায়াহিয়্যাহ দামেস্কে সহিহ বুখারির দরস দিতেন। তৎকালীন তিনি সবচেয়ে বড় মাপের স্কলারদের একজন হিসেবে পরিচিত ছিলেন।

দ্বাদশ শতকে আরেকজন স্কলার ছিলেন জয়নব বিনতে কামাল। তিনি চার শতাধিক হাদিসের কিতাব পড়াতেন।

ফাতেমা বিনতে মোহাম্মদ আল সমরকন্দির কথা বলা যায়। তিনি ছিলেন একজন ফিকাহবিদ। কীভাবে ফতোয়া ইস্যু করতে হয়, সে বিষয়ে তিনি তার অধিকতর বিখ্যাত স্বামীকে পরামর্শ দিতেন।

যেসব নারী সাহাবি কবিখ্যাতি অর্জন করেছিলেন তাদের মধ্যে রয়েছেন আরওয়া বিনতে আব্দুল মুত্তালিব, হজরত খানসা, সওদা বিনতে কোরায়য (হযরত উসমান (রা.)-এর খালা), হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর দুধবোন শায়মা, আতেকা বিনতে যায়দ ও অন্যান্য।

হজরত খানসা (রা.)-এর কবিতা নবীজি অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে শুনতেন, আর হাতে ইশারা করে বলতেন, হে খানসা, আরও কিছু শোনাও।

কারিমাহ আল মারওয়াযিয়্যাহ ছিলেন অনেক উচ্চস্তরের হাদিস বিশারদ। এছাড়াও ইমাম বুখারি প্রায় ৮০ জন নারী হাদিস বিশারদের কাছ থেকে হাদিস গ্রহণ করেছিলেন।

ইসলামের শুরু থেকে পরবর্তীতে কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত নারীদের দ্বারা হাদীস সংরক্ষণ, হাদীস চর্চা, গবেষণা, শিক্ষাদান প্রভৃতি চলছে। মুসলিম ইতিহাসে সর্বদাই কিছু বিখ্যাত হাদীসবেত্তা নারীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। জীবন-চরিত সম্বন্ধীয় অভিধানে এরূপ অনেক মুসলিম নারীর সন্ধান পাওয়া যায়।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সময়ে এবং পরে অনেক মহিলা সাহাবী বিশেষ করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্ত্রীগণ হাদীস বর্ণনা, ব্যাখ্যা ও প্রচারে ব্যাপক ভূমিকা রাখেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্ত্রীদের মধ্যে আয়েশা, হাফসা, উম্মে হাবীবা, মায়মূনা এবং উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা প্রতিটি হাদীসের ছাত্র-ছাত্রীর নিকট স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যধারী হাদীস বর্ণনাকারী হিসেবে পরিচিত।

তাবি'য়ীদের যুগে ইবনু সিরীনের কন্যা হাফসা, উম্মে আবূ দারদা এবং 'আমরাহ্ বিনতে আব্দির রহমান গুরুত্বপূর্ণ হাদীসবেত্তা হিসেবে পরিচিত। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা হতে বর্ণিত হাদীসের অন্যতম বিশেষজ্ঞ হচ্ছেন 'আমরাহ্ (র.)। তাঁর এক ছাত্র হচ্ছেন আবূ বকর ইবনে হাযম যিনি মদীনার প্রসিদ্ধ বিচারক ছিলেন, যিনি 'আমরাহ্ এর বর্ণিত সকল হাদীস লিখে ফেলার জন্য তৎকালীন খলীফা উমর ইবন আব্দিল আযীয (র.) কর্তৃক আদিষ্ট হয়েছিলেন।

এদের পরে 'আবিদা, 'আবদা ইবন বিশর, উম্মে 'উমর, যয়নাব, নফিসা, খাদীজা, 'আবদা বিনতে 'আব্দুর রহমান এবং আরো অনেক নারী হাদীসের উপর বিশেষ পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন এবং তাঁরা হাদীস শিক্ষা দিতেন। এসব নারীরা বিভিন্ন পরিবেশ থেকেই এসেছেন। যেমন আবিদা একজন দাসী ছিলেন এবং এ অবস্থায় থেকেই তিনি মদীনার শিক্ষকদের নিকট হাদীস চর্চা করেন। এটা বলা হয় যে, তিনি দশ সহস্রাধিক হাদীসকে তাঁর শিক্ষকদের সাথে সম্পর্কিত করেছেন।

চতুর্থ হিজরী শতাব্দীতে আমরা ফাতিমা বিনতে আব্দির রহমান, ফাতিমা (আবূ দাউদের নাতনী), আমাত আল্-ওয়াহিদ (বিখ্যাত আইনবিদ আল্-মুহামিলির কন্যা), উম্মে আল্-ফাৎহ আমাত আস্-সালাম (বিচারক আবূ বকর আহমদের কন্যা), জুমু'আ বিন্তে আহমদ ও আরো অনেক বিদূষীর পরিচয় পাই যাঁদের ক্লাসে সর্বদাই উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শ্রোতা উপস্থিত থাকত।

এ ধারা ৫ম ও ৬ষ্ঠ হিজরী সন পর্যন্ত চালু ছিল। ফাতিমা ইবন আল্-হাসান শুধু তার তাকওয়ার জন্যই পরিচিত ছিলেন না বরং হাদীস ও এর ইসনাদের গুণাগুণ বিচারে তাঁর জ্ঞানের প্রখরতার জন্যও পরিচিত ছিলেন। তার চেয়েও বেশি পরিচিত ছিলেন কারিমা আল্-মারওয়াযিয়্যা। তিনি ঐ সময়ে সহীহ্ আল্-বুখারীর সর্বোত্তম Authority হিসেবে পরিচিত ছিলেন। আল্-খতিব আল্-বাগদাদী ও আল্-হুমাইদী তাঁর অন্যতম ছাত্র ছিলেন।

শুহাদা একজন বিখ্যাত ক্যালিগ্রাফার, অত্যন্ত সম্মানিত ও নির্ভরযোগ্য হাদীসবিদ ছিলেন। জীবনী লেখকগণ তাঁর পরিচয় দেন এভাবে- তিনি ক্যালিগ্রাফার ও বিখ্যাত হাদীসের বর্ণনাকারী এবং নারী জগতের জন্য গর্ব ছিলেন। তার পিতা আবূ নাসর স্বীয় কন্যাকে গভীরভাবে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা দিয়েছেন এবং অনেক প্রসিদ্ধ হাদীস বিশারদদের অধীনে শিক্ষা লাভের ব্যবস্থা করেছিলেন। সহীহ্ আল্-বুখারী ও অন্যান্য হাদীস সংগ্রহ হতে তার বক্তৃতামালা শুনতে অনেক জ্ঞানপিপাসু জমায়েত হত; এমনকি কেউ কেউ তাঁর ছাত্র না হওয়া সত্ত্বেও তাঁর ছাত্র হবার মিথ্যা দাবী করত। সিইত আল্-ওজারা শুধু ইসলামী আইনের উপরই শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেন নি, তিনি 'তাঁর সময়ের মুসনিদা' হিসেবে পরিচিত ছিলেন। হিজাযের হাদীসের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত উম্মে আল্-খায়ের আমাত আল্-খালিক এভাবে বিভিন্ন ক্লাস পরিচালনা করতেন।

অন্যদিকে উম্মে আল্-খায়ের ফাতিমা এবং ফাতিমা আল্-শাহরাজুরিয়া সহীহ্ মুসলিম-এর উপর লেকচার দিতেন। ফাতিমা আল্-জাওযানিয়া তাবরানী থেকে তাঁর ছাত্রদের পড়াতেন। যয়নাব ইমাম আহমেদ ইবন হাম্বলের 'মুসনাদ' থেকে পড়াতেন। সেখানে

অনেক ছাত্র আকৃষ্ট হয়ে তার বক্তৃতা শুনত। জুওয়াইরিয়া বিনতে উমর এবং যয়নাব বিনতে আহমদ ইবনে উমর, আদ্-দারেমী ও আবদ ইবনে হুমাইদ এর হাদীস সংকলন হতে বর্ণনা করতেন।

বিস্ময়ের কথা হচ্ছে, পরিব্রাজক ইব্নে বতুতা দামেশকে থাকার সময় যয়নাব বিনতে আহমদ ও অন্যান্য শিক্ষিকার নিকট হাদীসের বিদ্যা লাভ করেন। দামেশকের বিখ্যাত ঐতিহাসিক ইবনে আসাকির বলেন, তিনি ১২০ জন পুরুষ ও ৮০ জন নারীর নিকট শিক্ষা লাভ করেন। সুয়ূতী ইমাম শাফে'য়ীর 'রিসালাহ্' গ্রন্থটি হাজার বিনতে মুহাম্মদের কাছে অধ্যয়ন করেন।

এ ছাড়াও যয়নাব বিনতে আল শা'রি একাধিক প্রসিদ্ধ হাদিসবেত্তা থেকে হাদীস অধ্যয়ন করেন এবং পরে ছাত্রদেরকে এসব শিক্ষা দেন যাদের কেউ কেউ পরে খ্যাতি লাভ করেন। যেমন সুপরিচিত জীবন চরিত সম্বন্ধীয় অভিধান 'ওয়াফাত আল্-'আ'ইয়ান' এর লেখক ইবনে খাল্লিকান তাঁর ছাত্র। আরেকজন হচ্ছেন কারিমা যাকে তাঁর সময়ে সিরিয়ার শ্রেষ্ঠ হাদীসবেত্তা হিসেবে ধরা হয়। ইবনে হাজার তার 'আল্-দুরার আল্-কামেনা' গ্রন্থে ৮ম শতাব্দীর ১৭০ জন প্রখ্যাত নারীর সংক্ষিপ্ত জীবনী উল্লেখ করেন। যাঁদের অধিকাংশই হাদীসবিদ ছিলেন এবং যাঁদের অনেকের অধীনে তিনি নিজে পড়াশোনা করেছেন। এসব মহীয়সী নারীর কয়েকজন আবার ঐ সময়ের সবচেয়ে জ্ঞানী হাদীস বিশারদ হিসেবে পরিচিত ছিলেন। উদাহরণস্বরূপ জুয়াইরিয়া বিনতে আহমদ-এর নাম উল্লেখ করা যেতে পারে, যিনি পুরুষ ও নারী উভয় রকমের পণ্ডিতদের নিকট থেকে হাদীস অধ্যয়ন করেছেন এবং তিনি নিজেও ঐ সময়ের বড় বড় মাদরাসায় শিক্ষকতা করেছেন।

ইবনে হাজার (র.) এ প্রসঙ্গে বলেন, 'আমার নিজের কিছু শিক্ষক এবং সমসাময়িক অনেকেই তাঁর বক্তৃতামালা শুনতেন।' আয়েশা বিনতে আবদ আল্-হাদী দীর্ঘদিন ইবনে হাজারের শিক্ষক ছিলেন। তাঁকে তাঁর সময়ের সর্বোচ্চ মানের হাদীসবিদ হিসেবে গণ্য করা হত এবং অনেক ছাত্রই দীর্ঘ পথ সফর করে তাঁর কাছে দ্বীনের সত্যজ্ঞান লাভ করতে ছুটে আসত।

নবম শতাব্দীতে হাদীসে নারী বিশেষজ্ঞদের সকল তথ্য পাওয়া যাবে মুহাম্মদ ইবনে আব্দুর রহমান আল্-সাখাবী রচিত “আদ-দ্বাউ উল-লামে‘ ” গ্রন্থে। এছাড়াও আবদ আল্-আযীয ইবনে উমর তার ‘মু‘জাম আল-শুয়ূখ’ গ্রন্থটিতে ১৩০ জন নারী স্কলারহ ১১০০-এর বেশী লেখকের শিক্ষকদের নাম উল্লেখ করেছেন। এসব মহিলাদের কেউ কেউ হাদীসবিদ্যায় বেশ পাণ্ডিত্য অর্জন করে ঐ সময়ে প্রখ্যাত ছিলেন। তন্মধ্যে উম্মে হানী, মারিয়াম উল্লেখযোগ্য। যিনি তার শৈশবেই কুরআনের হাফেযা হয়ে যান এবং ইসলামের থিওলজি, আইন, ইতিহাস ও ব্যাকরণে বিশদ জ্ঞান লাভ করেন। পরবর্তীতে তিনি হাদীস শাস্ত্রে গভীরতা লাভের প্রত্যাশায় কায়রো ও মক্কা শহরে গিয়ে ঐ সময়ের শ্রেষ্ঠ হাদীসবেত্তাদের থেকে জ্ঞান লাভ করেন। তিনি এতটাই দ্বীনদার ছিলেন যে, ন্যূনপক্ষে ১৩ বার হজ্জ সম্পাদন করেন। তিনি কায়রোর বিখ্যাত কলেজে ব্যাপক প্রোগ্রাম পরিচালনা করেন। অনেক স্কলারকে ‘ইজাযত্’ (তাঁর পক্ষ থেকে হাদীস প্রচারের অনুমতি) প্রদান করেন।

তাঁর সমসাময়িক সিরিয়ার বাই খাতুন হাদীস শাস্ত্রে অনেক শিক্ষক-শিক্ষিকার নিকট হতে ‘ইজাযত’ পেয়েছিলেন। তিনি নিজেও পরবর্তীতে এ বিষয়ে সিরিয়া ও কায়রোতে অনেক বক্তব্য রাখেন। আয়েশা ইবন ইবরাহীম ও মক্কার উম্মে আল্-খায়ের সাঈদা উভয়েই দামেশক, কায়রোসহ অন্যান্য শহরে জ্ঞানার্জনের জন্য গমন করেন এবং পরবর্তীতে তাঁরা বিভিন্ন শহরে সুনামের সাথে অন্যদেরকে শিক্ষা দেন।

গবেষণায় দেখা যায় যে, হিজরী দশম শতাব্দী হতে হাদীস শাস্ত্রে ও ইসলামের অন্যান্য বিষয়ে পাণ্ডিত্যলাভে নারীদের অংশগ্রহণ ও ভূমিকা ব্যাপকহারে কমে গেছে। দশম, একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে মাত্র ডজন খানেক প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ নারীর নাম পাওয়া যায়। যাঁরা মূলত নবম শতাব্দীর শেষের দিকে আবির্ভূত হন। আসমা বিনতে কামাল আল্-দীন হাদীসের উপর লেকচার দিতেন। ঐ সময়ের সুলতানের বিভিন্ন সিদ্ধান্তের বিষয়ে গ্রহণযোগ্য মতামত দিতেন এবং ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে নারীদেরকে প্রশিক্ষণ দিতেন। প্রখ্যাত বিচারক মুসলেহ আল-দীনের স্ত্রী আয়েশা বিনতে মুহাম্মদ দামিস্কের সালিহিয়া কলেজের অধ্যাপিকা ছিলেন। এলেপ্পোর ফাতিমা বিনতে ইউসুফ তাঁর সময়ের অন্যতম পণ্ডিত হিসেবে পরিচিত ছিলেন।

ফাতিমা আল্-জুযাইলিয়া অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারিণী ছিলেন। শেষ জীবনে তিনি মক্কায় অবস্থান করেন এবং সেখানে সমৃদ্ধ এক পাবলিক লাইব্রেরী গড়ে তোলেন। এপবিত্র মক্কা শহরে তিনি হাদীসের উপর লেকচার দিতেন এবং অনেকেই তাতে অংশগ্রহণ শেষে তাঁর নিকট হতে সার্টিফিকেট গ্রহণ করতেন।

ইতিহাস ঘাটলে এটা পরিষ্কার হয় যে, মুসলিম নারীরা জ্ঞানার্জনে উজ্জ্বলতম নক্ষত্র হবার চেষ্টা চালিয়েছেন।ইবনে আল্-বুখারীর সার্টিফিকেট ফলিওতে দেখা যায়, ৫৮৭/১২৮৮ সনে দামিস্কের উমর মসজিদে অনুষ্ঠিত ১১ বক্তৃতার একটি নিয়মিত কোর্সে অনেক নারী উপস্থিত থাকতো। অন্যদিকে দামিস্ক (৮৩৭/১৩২২ সনে) পাঁচ লেকচারের একটি কোর্সে পঞ্চাশাধিক ছাত্র-ছাত্রী উপস্থিত ছিলেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। উল্লেখ্য, এ কোর্সটি পরিচালিত হত প্রখ্যাত মহিলা হাদীস বিশারদ উম্মে আব্দুল্লাহ কর্তৃক।[1]

বর্তমান সমাজে ইসলাম প্রচারে নারীদের ভূমিকা

ইতিহাসের উজ্জ্বল পাতাগুলো আজ পশ্চিমাদের চক্রান্তে হারিয়ে যাচ্ছে। হারিয়ে যাচ্ছে মুসলিমদের সেই সংগ্রামী তেজ। যেখানে মুসলিমদের নাম শুনলে কাফির মুশরিক ইহুদিরা ভয়ে কোনঠাসা হয়ে যেত সেখানে আজ মুসলিম জাতিকে তারা পায়ের নিচে ফেলে রেখেছে। এর মূল কারনই হল আমাদের মা বোনেদেরকে সেই আদর্শ হতে দূরে রাখা। শত্রুরা জানে যে, নারীদের যদি ইসলামের আসল শিক্ষা থেকে দূরে সরিয়ে তাদের মাঝে নারীবাদী নামক ভাইরাস ঢুকানো যায় তাহলে মুসলিম জাতি খুব সহজেই কোনঠাসা হয়ে যাবে। তারা সত্যিই মুসলিম নারীদের মধ্যে এই বিষ ছড়িয়ে দিয়েছে। তারা প্রথমেই নারীদের অন্দরমহলে বন্ধি না থেকে দুনিয়াতে বের হওয়ার পরামর্শ দিয়েছিল। তারাও সেটা সানন্দে গ্রহণ করেছে। তারপর নারীদের লজ্জা নামক সবচেয়ে মূল্যবান ভূষণকে কেড়ে নিয়েছে। পর্দা কেড়ে নিয়েছে। দ্বীনি পড়াশোনা কেড়ে নিয়ে স্কুল কলেজকে বানিয়েছে ফ্রি মিক্সিং এর কারখানা। যেখানে যেনা ব্যাভিচার কোন ব্যাপারই না। নারীর পর্দাই যেন অস্বাভাবিক কিছু কিন্তু বেপর্দা বেপরোয়াভাবে চলাফেরা একদম স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে দাড়িয়েছে। স্বামীর অনুগত্য পালন করা, সন্তানকে সময়

দেয়া, দ্বীনি শিক্ষা দেওয়া এসব মুসলিম নারীদের কাছে নারীবাদী ছাড়া কিছুই নয়। তারা পুরুষের সাথে সমান ভাবে চলতে চায়। সকল অফিস আদালতে নারী- পুরুষদের সহবস্থান হয়ে গেছে। দ্বীনি শিক্ষা আজ ফোর সাবজেক্ট হয়ে গেছে। দুনিয়ার পড়াশোনা গুলোই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তাদের কাছে। দ্বীনি পড়াশোনা করে তো আর ভাল চাকরি, মোটা অংকের স্যালারি পাওয়া যাবে না। তাইতো দিন - রাত খেটে দুনিয়া পাওয়ার জন্য কত দৌড়ঝাপ তাদের। তারা একেকজন হচ্ছে ব্লগার, টিকটকার নামক জাহান্নামের ইন্ধন। চিরস্থায়ী আখিরাতের কথা একদম ভুলতে বসেছে। হারিয়ে যাচ্ছে সোনালি যুগের ইতিহাস। আর তৈরি হয় না ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত সেই মুসলিম নারীদের মত কেউ, যারা ইসলাম প্রচারে নিজেদের নিয়োজিত করবে। সন্তানদেরকে সঠিক তরবিয়ত শেখাবে। বীর মুজাহিদ গড়ে তুলবে। আর যারাও দ্বীন জ্ঞানার্জন ও প্রচার প্রসারে নিয়োজিত তাদের জীবনে প্রায়ই নেমে আসে নানামুখী পরীক্ষা। অত্যাচার - নির্যাতন এমনকি জেল জরিমানা থেকে শুরু করে ফাসির মঞ্চ পর্যন্তও পৌঁছে যায়।

বর্তমান সময়ে নারীদের করণীয়

ইসলাম কখনোই নারীদের বন্দি করে রাখে না। কিংবা পড়াশোনা করতে অনুৎসাহিতও করে না। বরং আরও জ্ঞানার্জনের জন্য তাগিদ দেয়।

পশ্চিমা বিশ্বের প্রভাবে মুসলিম নারীরা যেমন অন্ধকারের অতল গহ্বরে তলিয়ে যাচ্ছে তেমনি এর মাঝে থেকেও একদল নারী ইসলামের সঠিক দিকনির্দেশনা মোতাবেক চলার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছেন। অফলাইনের পাশাপাশি অনলাইনের জগতেও চেষ্টা করছে সঠিক শিক্ষায় নিজেকে গড়ে তুলতে। এমনই কিছু অনলাইন প্রতিষ্ঠানও গড়ে উঠেছে যেখানে সর্বস্তরের মুসলিম নারীরা ইসলামের সঠিক জ্ঞান অর্জন করতে পারবে। সেগুলো হল IOM (Islamic Online Madrasa) , Inbaat Academy, Tazkiya Institute, Tayyeba Academy, At Taqwa Online Academy Aslaf Academy এরকম আরোও অনেক নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান রয়েছে যেখানে ঘরে বসেই কম খরচে বিজ্ঞ উস্তায-উস্তাযার তত্ত্বাবধানে শিক্ষা গ্রহন করতে পারছে। আলহামদুলিল্লাহ।

আজ চারপাশের অবস্থা দেখে অনেক মা বোনেরা বুঝে গেছে দ্বীনি শিক্ষা ছাড়া কোন উপায় নেই। জেনারেল শিক্ষার যে হাল হাকিকত তাতে সন্তানেরা সঠিক জ্ঞান তো পাবেই না বরং সমাজের জন্য ফিতনার কারন হয়ে যাচ্ছে। তাইতো আজ নিজেদের এবং সন্তানদের কল্যানের জন্যই প্রতিটি মা বোনের দ্বীনের সঠিক জ্ঞানার্জন করা ফরজ হয়ে গেছে। একজন দ্বীনদার শিক্ষিত মা ই পারে তার সন্তান, তার স্বামী, তার পরিবারের সদস্যদের সঠিক দিক নির্দেশনা দিয়ে নৈতিক বিবেকবান মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে।

আমরা আমাদের সন্তানদের অবশ্যই ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত ইসলামের গল্পগুলো শোনাব। নবিজির জীবন কাহিনি, আসহাবে সাহাবীদের জীবন কাহিনি এসব ছোট থেকেই তাদের মন মগজে গেথে দেওয়ার চেষ্টা করব। গল্পের মাধ্যমে তাদের ইসলামি নীতিবোধ শেখাব। ইন্টারনেট থেকে দূরে রাখার চেষ্টা অবশ্যই করতে হবে। না হলে সন্তানের নষ্ট হওয়ার পথে এক ইন্টারনেটই যথেষ্ট। তাদেরকে ইন্টারনেটের কল্যানকর ও অকল্যাণকর উভয় সাইট গুলো সম্পর্কে অবগত করব।

আমরা পরিবারের ছোট সদস্যের সাথে সময় দেওয়ার চেষ্টা করব। ইসলামি শরিয়তে যে খেলাগুলো জায়েজ এবং একজন বীর মুজাহিদ হিসেবে গড়ে তুলতে যে ট্রেনিং গুলো দেওয়া সম্ভব সেগুলো চেষ্টা করব ইন শা আল্লাহ।

সন্তানদের ছোট থেকেই সুন্নাহ গুলোর অভ্যাস করাতে হবে। যে স্কুল বা মাদ্রাসায় ভর্তি করাব সে সম্পর্কে ভালোভাবে জেনে নিয়ে তারপর সেখানে শিক্ষার জন্য পাঠানো। এমনকি পরিবার ও পরিবারের বাইরের সদস্যদের নিয়ে পারিবারিক ও সামাজিক বৈঠক করা যেতে পারে। আমরা যদি আমাদের সন্তান, মা-বাবা, স্বামী, পরিবার ও পরিবারের বাইরে যারা আছেন তাদের মাঝে ইসলামের সঠিক শিক্ষাগুলো বিলিয়ে দিতে পারি তবেই আমাদের সমাজ পরিবর্তন হবে। ইন শা আল্লাহ।

আমরা দুনিয়া ও আখিরাতেও সম্মানিত হব। আল্লাহ যেনো আমাদের প্রতিটি মা বোনকে হিদায়াত দান করেন। ইসলামের সঠিক শিক্ষাগুলো অর্জন এবং সেগুলো পরিবারে, সমাজে এমনকি সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে পারে সেই তৌফিক দান করেন। ওয়ামা তৌফিকি ইল্লা বিল্লাহ।।

সমাপ্ত